অপেক্ষমাণ : সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক কাব্যনাটক

জান্নাত আরা সোহেলী*

[সারসংক্ষেপ : *অপেক্ষমাণ* সৈয়দ শামসুল হকের একটি নিরীক্ষামূলক কাব্যনাটক। সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি, নারীর প্রতি বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাকে তিনি এ নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে নিজের রচনার পাশাপাশি সাহায্য নিয়েছেন বিশ্বখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের নাট্যকর্মের। ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নাটকের নির্যাসকে নূতনবিন্যাসে সাজিয়ে তিনি নূতন একটি শিল্পসার্থক নাটক রচনায় সক্ষম হয়েছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হকের নিরীক্ষাপ্রবণ নাট্য-মানস অনুসন্ধানই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।]

এক

সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) নিরীক্ষাধর্মী কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ* (২০০৯)। 'হেনরিক ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০০৯'-এ মঞ্চায়নের জন্য নাট্যপরিচালক আতাউর রহমানের বিশেষ অনুরোধে নাটকটি তিনি রচনা করেন।[১] নাটকটিতে তিনি স্বরচিত কাব্যনাটক *ঈর্ষা (১৯৯০)* এবং নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক যোহান ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) রচিত নাটক *এ ডলস হাউস (১৮৭৯)* ও *এন এনিমি অব দ্য পিপল (১৮৮২)* নাটকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও চরিত্রের অসাধারণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তবে হেনরিক ইবসেনের বিশ্বখ্যাত নাট্যকর্ম থেকে উৎসরস আহরণ করলেও তিনি তার মধ্যে নবপ্রাণরস সঞ্চার করে নাটকটিকে সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা হিসেবে নির্মাণ করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের এ-ধরনের নিরীক্ষাধর্মী রচনার সাফল্য নিয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মর্তব্য :

> কখনো কখনো মনে হয় একই লেখা দুইবার, তিনবার, চারবার লিখছেন একজন লেখক। সৈয়দ হক সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলার কোনো অবকাশ নেই। কারণ একটা লেখার পরে তিনি সেই লেখার বিন্যাসের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাননি। তাঁর নতুন লেখা মানেই নতুন বিন্যাস। (জাকির, ২০১৬ : ৯৩)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষার* প্রৌঢ় চরিত্র, *এ ডলস হাউস*-এর নোরা চরিত্র ও *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার চরিত্রকে একই মঞ্চে উপস্থাপন করে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সমাজ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যসমাজের মিল-অমিল ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনটি পৃথক সমাজের পৃথক চরিত্রকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন—জীবনে সত্যের সম্মুখে দাঁড়ানোর মতো মহৎ আর কিছুই নেই; নিজেকে আবিষ্কার করতে হলে মানুষকে নিজের মনের আয়নাতেই নিজেকে চিনে নিতে হয়। শত বছর পূর্বে নাট্যকার ইবসেন আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা ও সত্যের বিজয়ের যে কথা তাঁর নাটকে বলে গেছেন, শতবর্ষ পরে সৈয়দ শামসুল হক তেমনি একটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন *ঈর্ষা* নাটকে—যেখানে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ এক প্রৌঢ়চরিত্র চরম একাকিত্বের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকের কোরাসচরিত্র ব্রেকডান্সার দল নাচের তালে তালে নাটকের প্রারম্ভে এ কথাই বলে গেছে দর্শকের উদ্দেশ্যে :

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

> হক আর ইবসেন [...]
> বলবেন—বলেছেন
> একা হয়ে যেতে হয় সত্যের সমুখেই
> শক্তিটা আছে শুধু সত্যেই—সত্যেই (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৩)[২]

মূলত, সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের বাস্তববাদী ধারার পথিকৃৎ, নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের অনুরাগী ছিলেন; তাঁর রচনায় এই লেখকের প্রভাব নাটকের ভাবাদর্শ ও রচনারীতি উভয়দিক থেকেই প্রতীয়মান হয়। বিশেষত রচনার ভাবাদর্শগত দিক বিচার করলে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে সৈয়দ শামসুল হকই হেনরিক ইবসেনের নাট্যাদর্শের যথার্থ উত্তরসাধক; কলুষমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত একটি সুসভ্য সমাজ-নির্মাণ ও সুশিক্ষিত-জাতিগঠনই ছিল উভয় লেখকের রচনার মৌল উদ্দেশ্য; তাঁরা উভয়েই সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, অপসংস্কৃতি, ধর্মের নামে অনাচার, রাজনীতির নামে স্বৈরাচার, রাষ্ট্রক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী আচরণে ব্যথিত হয়েছেন এবং সমাজলগ্ন নাট্যরচনার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান সমাজে প্রচল বিশ্বাস ছিল—সমাজ সর্বদা একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজে প্রচল নিয়মনীতি যতই ভ্রান্ত হোক, মানুষের জন্য ক্ষতিকর হোক, তবু সেই ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারও নেই। হেনরিক ইবসেন তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকে প্রচলিত এ-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করেছেন। তিনি অদক্ষ সংঘশক্তির অসারতা দেখিয়ে বলেছেন—দশজন মিলে একটি মিথ্যাকে সত্য বললেই সেটি সত্য হয়ে যায় না; বরং সেটি মিথ্যাই থাকে। আর সমাজে যদি এগারোতম ব্যক্তি একাই সে সত্য প্রকাশ করে তবে সেটি সত্যই। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবসময় কল্যাণ বয়ে আনে না। জনগণকে আগে প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে হয়, ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান থাকতে হয়। মানুষ কেবল আকারে মানুষ হলেই হয় না, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করে নিতে হয়। হেনরিক ইবসেন তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকে সত্যান্বেষী নির্ভীক ডাক্তার চরিত্রটির জবানিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'জনগণ'-এর মতো জাদুশব্দ দিয়ে আর আমার মগজধোলাই করা যাবে না। না, আর না। একদল প্রাণী মনুষ্য-আকৃতির হলেই জনগণ হয়ে যায় না। জনগণের সঙ্গে সম্মান জড়িত এবং সে সম্মান নিজেদেরই অর্জন করতে হয়। [...] আমি বিপ্লবী। সংখ্যাগরিষ্ঠ সবসময়ই সঠিক—যুগপ্রাচীন এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করছি। [...] যিশু যখন ক্রুশে চড়েছিলেন তখনও কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ভুল ছিল? পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা বিশ্বাস না-করে সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন গ্যালিলিও-কে কুকুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে তখনো কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ভুল? সঠিক কী সেটা বুঝতেই সংখ্যাগরিষ্ঠের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যায়। নির্ভুল কাজটি যতক্ষণ পর্যন্ত না-করে ততক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সঠিক নয়। (খায়রুল, ২০১৮ : ৮৩-৮৫)[৩]

এন এনিমি অব দ্য পিপল নাটকের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নরওয়ের ছোট্ট একটা শহরে নবনির্মিত পাবলিকবাথ প্রকল্পের পানি দূষণ নিয়ে। শহরের নাগরিকদের পানিসমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকারি প্রকল্প হিসেবে এটি নগর মেয়রের তত্ত্বাবধায়নে নির্মাণ করা হয়েছে; কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাব, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে পানিপ্রকল্পের সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। এসময়ে সত্যান্বেষী ডাক্তার থমাস স্টকম্যান গবেষণা করে দেখেছেন, পানিদূষণের মূলকারণ প্রকল্পের অদূরে অবস্থিত ট্যানারি কারখানা। তাই অতিদ্রুত বাথপ্রকল্পের স্থান সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন; তা না হলে এটি দীর্ঘমেয়াদে শহরের নাগরিকের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারের এই আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে প্রথমে সাংবাদিক, সুশীলসমাজ তাকে সাধুবাদ দিলেও, নগরপিতা পিটার স্টকম্যান যখন স্বীয়স্বার্থে ডাক্তারের

বিরোধিতা করেছেন, তখন তারাও ক্ষমতাকাঠামোর দম্ভে ভীত হয়ে দুর্নীতিবাজ মেয়রকে সম্মিলিতভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এদের কেউই সত্যের জন্য নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে কিংবা মেয়রের রোষানলে পড়তে চাননি। মেয়র তাদের বুঝিয়েছেন—এই পানিপ্রকল্প নগরবাসীর জীবনমানে পরিবর্তন এনেছে, শহরে পর্যটক আসছে, জনগণের উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে ডাক্তারের কথায় পানিপ্রকল্প পুনর্নির্মাণ করতে গেলে নগরবাসীকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। ফলত, সুবিধাবাদী জনগণ তাদের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার কথা চিন্তা না করেই, আপাতপ্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গা ভাসাতে চাইছে।

কিন্তু ডাক্তার নিজের স্বার্থের কথা না ভেবেই একা শেষপর্যন্ত সত্যের পক্ষে লড়ে গেছেন। ফলস্বরূপ, তার পৌরসভার চাকুরি গেছে, মেয়ে স্কুলের চাকুরি হারিয়েছে, ছেলেরা স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, এমনকি জনগণ উন্মত্ত হয়ে তাকে 'জনতার শত্রু' উপাধি দিয়ে ঘর-বাড়ি ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছে। এরকম বিরূপ পরিস্থিতিতে তিনি প্রথমে ভেবেছেন প্রিয় শহর পরিত্যাগ করে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন; কিন্তু পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছেন এবং সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন—প্রতিকূল পরিবেশে যে মানুষ সত্যকে অবলম্বন করে একা দাঁড়াতে পারে, পৃথিবীতে তার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই; এবং সত্যকে অবলম্বন করে একা সংখ্যাগরিষ্ঠ মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করে যাওয়াই হওয়া উচিত মানবজীবনের ব্রত। ইবসেনের এমন নাটক লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইবসেন-অনুবাদক খায়রুল আলম সবুজ নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> অর্গানাইজড লিবারেলদের প্রতি ইবসেন আগে থেকেই চটে ছিলেন। *গোস্ট* নাটকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সেই আগুনে যেন ঘি ঢাললো। রাষ্ট্র ধারণাকেও তিনি এক সময় ব্যাক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। [...] গণতন্ত্র অপরিহার্যভাবেই বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং দুঃখজনকভাবে প্রায় সবসময়ই দল রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করাই দলগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সেক্ষেত্রে যে যত মানুষ দলে টানতে পারবে লাভের আশা তার তত বেশি। দেশ ও দশের মঙ্গলচিন্তা তখন অন্তরালে চলে যায়। [...] মানুষের মানসম্মত মূল্য সেখানে গৌণ হয়ে যায়—ভোটাভুটির ক্ষেত্রে সংখ্যাই সবশেষ কথা। এমন পরিস্থিতিতে ইবসেন বলেছেন—The state is the curse of individual! ব্যক্তি সেখানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাসের কথাই তিনি তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল*-এ উপস্থাপন করেছেন। অর্গানাইজড লিবারেলদের প্রতি তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তথাকথিত লিবারেল সংবাদপত্রের প্রতি বিরক্তি। (খায়রুল, ২০১৮ : ১৩)

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর হেনরিক ইবসেন রচিত নাটকের এ বিষয়টি অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে *অপেক্ষমাণ* নাটকের ঘটনাংশ বিন্যস্ত করেছেন।

অন্যদিকে, ইবসেনের *এ ডলস হাউস* বিশ-শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার প্রর্দশিত নাটক। ১৮৭৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কোপেনহেগেন থেকে প্রকাশিত এ-নাটকটি সারাবিশ্বে সাড়া-জাগানিয়া একটি দর্শকনন্দিত নাটক। নাটকটির বিষয়ও চমকপ্রদ। নাটকটির মূলভাব সম্পর্কে সমালোচক একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন :

> নারীর দাসত্বের ওপরে যে সমাজের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, নারীত্ব, সতীত্ব, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি নীতির শ্লোগান আউড়িয়ে, নারীকে শৃঙ্খলিত করেছে যে সমাজ, সেই সমাজ ইবসেনের মতে কোনোদিনই সত্যিকার মনুষ্যত্ব-লাভের সহায়ক নয়। *A Doll's House*- এর বাণী সত্যিই বিস্ফোরক— [...] নারীকে নিয়ে আর পুতুলখেলা চলবে না। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৬)

বস্তুত, হেনরিক ইবসেন তাঁর *এ ডলস হাউস* নাটকে দেখিয়েছেন—পারিবারিক পরিসরে একজন নারী সাধারণ মানুষের মতো পরিচর্যিত ও বিবেচিত হন না; তার জন্য রয়েছে সমাজ নির্ধারিত পৃথক নিয়ম। এমনকি প্রচলিত ধর্মও নারীকে কেবল সমাজের প্রতি, স্বামীর প্রতি, পরিবারের প্রতি, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা বলে; কিন্তু সমাজ বরাবরই তার নিজের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে; তাকে মানুষরূপেই গণ্য করে না। আলোচ্যমান নাটকে সাধারণভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, প্রধান দুই চরিত্র নোরা এবং হেলমার দাম্পত্য জীবনে বেশ সুখী। হেলমারের নূতন ব্যাংকে চাকুরির সুবাদে অতীতের সমস্ত দৈন্য কাটিয়ে সন্তান, সহকারী, স্ত্রী, বন্ধু পরিজন নিয়ে হেলমার উদযাপন করছে সুখী-সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবন। এমনকি স্বামী হিসেবে হেলমারের স্ত্রী নোরার প্রতি ভালবাসারও কোনও কমতি নেই। কিন্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, আপাত সুখী এ-সংসারজীবনে কোথাও যেন একটি লুকায়িত দীর্ঘশ্বাস বিদ্যমান; এবং বলাবাহুল্য সেটি নোরার একজন মানুষ হিসেবে সংসারে বঞ্চিত হবার দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু একজন নারী কেবল কন্যা, স্ত্রী, জননী হতে পৃথিবীতে আসেনি। একজন মানুষ হিসেবে পুরুষের মতোই তার ভূমিকা রয়েছে সমাজে। অথচ সমাজ-সংসারে সে ক্রমাগত অবমূল্যায়িতই থাকে। পিতার সংসারে নোরার জীবন ছিল পুতুলের মতো। দাম্পত্যজীবনেও সে পুতুলের মতোই বিনোদনের অংশীদার। এমনকি সন্তান-সন্ততিও তার কাছে পুতুলতুল্য। তাদের ভালো-মন্দ নির্ধারণে কিংবা সংসারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তার ভূমিকা নেই। ফলে তার হৃদয়ে ক্রমাগত অনুরণিত হয়েছে আক্ষেপ ও বিষাদের সুর। যেকারণে সে সংসার ছাড়ার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখিয়েছে—চাইলে একজন নারীও জীবনের ব্যাপারে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নোরার এ আক্ষেপ *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> বাবা আমাকে আদর করে পুতলি ডাকতেন।
> আমি যেমন পুতুল খেলা করতাম, তিনিও আমাকে নিয়ে পুতুলই
> খেলতেন।
> তারপর যখন তোমার কাছে থাকতে এলাম— [...]
> তুমি তোমার রুচি তোমার ভালো লাগা তোমার ইচ্ছে নিয়ে বাড়িতে,
> আর আমি তোমার রুচি তোমার ভালো লাগা নিয়ে তোমার
> ইচ্ছের পুতুল। [...]
> আজ পেছন ফিরে দেখে সব—মনে হচ্ছে
> দাসীর জীবন ছিলো আমার। দাসীরই জীবন আমি কাটিয়ে গেছি।
> তোমার সুঁতোর টানে নেচে গেছি শুধু। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১১-৫১২)

তবে *এ ডলস হাউস* নাটকের বিবৃত কাহিনি সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করেছেন। শুরু থেকে মূল কাহিনি না দেখিয়ে নোরা যখন সংসারত্যাগী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, *অপেক্ষমাণ* নাটকে তখন থেকেই নাট্যঘটনা নারী ও পুরুষ নামক চরিত্রের সংলাপ-প্রতিসংলাপের মাধ্যমে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার, নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকে নোরা চরিত্রের দৃঢ়তা পুরোপুরি অক্ষুণ্ন রাখলেও হেলমার ও নোরার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ বদলে দিয়েছেন। যেমন : *এ ডলস হাউস* নাটকে নোরা ক্রগসতাদের হুমকিতে ভীত হয়ে তাকে চাকুরিতে বহাল রাখার জন্য স্বামী হেলমারকে সুপারিশ করেছে; হেলমার সে শুপারিশ রাখেনি দেখে নোরা রুষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু *অপেক্ষমাণ*- নাটকে দেখা গেছে স্ত্রী চরিত্রটি বারবার নিষেধ সত্ত্বেও স্বামী কেবল তার ব্যক্তিস্বার্থে একটি নেতিবাচক চরিত্রকে ব্যাংকে চাকুরি দিয়েছে। এখানে স্ত্রীর অনুরোধ, ভালোবাসা, মর্যাদার থেকে বেশি হয়ে গেছে স্বামীর ব্যক্তিস্বার্থ। আর এই ভালোবাসাহীনতার কষ্ট, সংসারে আত্মমর্যাদাহীন অবস্থানের যন্ত্রণা ভুলতেই স্ত্রী সংসার ছাড়তে চেয়েছে; নিজেকে শিক্ষাদীক্ষায় আত্মিক উন্নয়নে এমন

শিখরে নিতে চেয়েছে, যেখানে পুরুষের অমর্যাদাকর প্রত্যক্ষণ কোনও ভূমিকাই রাখতে পারবে না। *এ ডলস হাউসে* এতদ্‌সংক্রান্ত সংলাপ নিম্নরূপ :

> নোরা। আট বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলাম আমি—কারণ, আমি জানতাম যে অলৌকিক ঘটনা রোজ ঘটে না। তারপরে, এই বিপদটা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। [...] ক্রগসতাদের চিঠিটা যতক্ষণ ওই চিঠি-ফেলার বাক্সের মধ্যে পড়েনি ততক্ষণ আমি একমুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি যে তার শর্তের কাছে তুমি মাথা নোয়াবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি তাকে বলবে : 'আমিই অপরাধী।' সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। [...]
>
> হেলমার। নোরা, তোমার জন্যে দিনরাত আমি খুশী হয়ে কাজ করতে পারি—সহ্য করতে পারি দুঃখ আর দারিদ্র্য। কিন্তু যাকে মানুষ ভালবাসে তার জন্যে সে নিজের সম্মানকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।
>
> নোরা। লাখো লাখো নারী সে কাজ করছে।
>
> হেলমার। মূর্খ শিশুর মতো কথা বলছো তুমি। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৮৭)[৪]

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে এ অংশকে নিম্নরূপে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন :

> স্ত্রী। [...] আজ সন্ধ্যায় দেখলাম তুমি দেবতার স্থান থেকে নেমে এলে। [...] যখন দেখলাম তুমি
> আমার কথা রাখলে না।
> তুমি একটা ভণ্ড প্রতারককে—যে আমার বিরুদ্ধে এতকিছু করেছে,
> তাকে তুমি ব্যাংকের চাকরির জন্যে সুপারিশ করলে, চাকরিটা পাইয়ে দিলে!
> সে আমার চেয়ে বড় হয়ে গেলো তোমার কাছে, কারণ আমি
> তো ঘরের নারী!
> আর সে, ব্যাংকে কাজ পেলে তোমার ব্যবসাবাণিজ্যে, ব্যাংক
> থেকে ঋণ টিন পেতে,
> সে তোমার সাহায্যে লাগবে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৭)

তবে *অপেক্ষমাণ* নাটকের মূল সমস্যা কেবলই নোরা তথা নারীর অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এ সমস্যাটি সর্বজনীন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমস্যা। নাট্যকার নাটকটির মাধ্যমে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, আধুনিক বিচ্ছিন্ন মানুষের উচিত—নিজের আমিত্ব ও অস্তিত্বকে প্রশ্ন করা এবং মর্যাদারক্ষার লড়াইয়ে যাবতীয় সামাজিক পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে আত্মাকে মুক্ত করা।

অন্যদিকে, সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষা* নাটকটি রচনা করেছেন প্রচলিত নাট্যধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি এ নাটকে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাজনে না গিয়ে একই দৃশ্যে পুরো ঘটনাক্রিয়া সাজিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনও পারিবারিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত কাহিনি প্রদর্শন নয় বরং মানব-মানবীর প্রেমজনিত ঈর্ষার রূপ উদ্ঘাটনই ছিল তাঁর মৌল উদ্দেশ্য। আর এ কারণেই তিনি তিনটি চরিত্রের সাতটি মাত্র সংলাপে পুরো নাট্যঘটনা সাজিয়েছেন।

এই তিনটি নাটকের অন্তঃসার সমীকৃত করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটক। বস্তুত *অপেক্ষমাণ* নাটকের তিনটি চরিত্রই তিনটি আদর্শকে ধারণ করে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে। তিনটি চরিত্রই একাকিত্বকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। প্রৌঢ় চরিত্রটি ছাত্রীর মোহ কাটিয়ে, শরীরী প্রেম ভুলে প্রকৃতির মধ্যে শিল্পের শুদ্ধতা সন্ধানে উন্মুখ। নারী চরিত্রটি সংসারে, সমাজে নারীর আত্মমর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্যদিকে পুরুষ চরিত্রটি সমাজ থেকে মিথ্যের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে নিপাট সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প।

অপেক্ষমাণ নাটকের প্রধান অবলম্বন প্রচলিত সমাজ। এখানে নাট্যকার যে তিনটি নাটকের সমন্বয়সাধন করেছেন, তাতে ইবসেন রচিত নাটক দুটির মূল বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও মানুষের পশ্চাৎপদ মানসিকতার বিরুদ্ধে ব্যক্তির দ্রোহ। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হকের নাটক *ঈর্ষা* নারী-পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে হলেও তাতে সমাজচিত্রের উপস্থাপনা রয়েছে। নাট্যকার সেখানে সমাজ ও দেশের বিপন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের মূল্যবোধ বদলে যাওয়ার বাস্তবচিত্র অংকন করেছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক নারী ও পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে ইবসেন বর্ণিত সময় ও সমাজকে নিজ দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে ঢেলে সাজিয়েছেন। ফলে *অপেক্ষমাণ* হয়ে উঠেছে সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক জীবনচিত্র।

প্রচলিত সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে সমাজের কাছে বলি দেয়। সামাজিক মানুষের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায় সমাজের ভাবনা। লোকে কী বলবে, লোকে কী ভাববে এটিই যেন হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়; তার নিজস্ব পছন্দ, নিজস্ব আনন্দ বা সুখ-সুবিধার সেখানে কোনও মূল্য নেই। নাট্যকার সমাজের এই দিকটি *অপেক্ষমাণ* কাব্যনাটকে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্ত্রী যখন নিজের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে গৃহত্যাগী হতে চাইছে, তখন স্ত্রীকে জীবনভর হারাবার চিন্তা থেকে স্বামীর একমাত্র ভাবনা হয়ে উঠেছে তার স্ত্রীর এহেন কর্মকাণ্ডে লোকে কী ভাববে! ফলে সে স্ত্রীকে যুক্তি দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে নয়, সমাজ-নির্ধারিত কর্তব্যগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। যে সমাজে নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানেই তাকে প্রতিমুহূর্তে মূর্খতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় :

স্বামী। সুস্থতা? বাড়ি ছেড়ে যাওয়া? স্বামী ছেড়ে যাওয়া? বাচ্চাদের
ফেলে যাওয়া?
একবারও ভাবছো না—লোকে কী বলবে?
স্ত্রী। লোকের কথা তুলো না। আমার কথা বলো। [...]
স্বামী। মূর্খ মেয়েমানুষ! নিজের পবিত্র কর্তব্যের কথা ভুলে যাচ্ছো?
[...] স্বামী, সন্তান—তোমার কোনো দায়িত্ব
কর্তব্য কিচ্ছুই কি নেই?
স্ত্রী। পবিত্র—আরো অন্য দায়িত্বও তো থাকতে পারে। [...]
আমার নিজের প্রতি কর্তব্য—দায়িত্ব। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৪)

বস্তুত, স্ত্রীচরিত্রটি জেনে গেছে সমাজে মানুষ হয়ে বাঁচতে গেলে নারীকে প্রথম আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে এবং তা পুরুষের সাহায্য ছাড়াই। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে হেয় করা, ছোট করে রাখাই যেখানে কাজ, সেখানে কেউ-ই চাইবে না একজন নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আর এটা বুঝতে পেরে সে সংসার ছেড়েছে এবং স্বামীর দেয়া কোনও কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি; কেননা সে অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। যে কারণে স্বামীকর্তৃক প্রতিমাসে অর্থপ্রেরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে বলেছে :

এখন আমাকেই যোগ্য করে তুলতে হবে আমাকে।
আমাকেই নিতে হবে পাঠ।
সে পাঠ দেবার যোগ্যতা তোমার নেই।
আজ আমিই আমাকে পাঠ দেবো। [...]
আমাকে এখন থেকে একাই পথ চলতে হবে— (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৩)

প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একজন নারীর প্রতি বরাবরই বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে। শৈশব থেকেই নারী বুঝে যায়, প্রচলিত সমাজে পুরুষের সমতুল্য সে কিছুতেই নয়। অথচ নারীরও অধিকার রয়েছে এ সমাজে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার। আর এ কারণে স্ত্রী চরিত্রটি চেয়েছে সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও বাধা-বন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে। স্বামী চরিত্রটি যখন সমাজ-নির্ধারিত বিধান এবং স্বামী-সন্তানের প্রতি তার দায়িত্বের কথা বলে তাকে গণ্ডিবদ্ধ করতে চেয়েছে, তখনই নারী চরিত্রটি প্রতিবাদ করে বলেছে :

> ওসব বড় বড় কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই।
> আমাকে মানুষের মতো বাঁচতে হবে,
> যেমন তুমিও মানুষের মতোই বাঁচতে চাও।
> আমাকে স্ত্রী নয়, মা নয়, মানুষ হয়ে উঠতে হবে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৪)

ফলত স্ত্রীকে গৃহপরিবেশে অবরুদ্ধ রাখার শেষ উপায় হিসেবে পুরুষ চরিত্রটি তাকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী নারীচরিত্রটি তখন প্রচলিত ধর্মকেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে জানিয়েছে, ধর্ম তো আসলে পুরুষেরই রচনা, পুরুষেরই বর্ণনা; সেখানে নারীর মতামত, অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষিত। ফলত নিজ কর্তব্য, নিজধর্ম সে নিজেই এখন বুঝে নিতে চায় :

> ধর্ম তো এই—মোল্লারা যা বলে, পাদ্রীরা যা বোঝায়, যা ব্যাখ্যা করে!
> এবার আমাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে।
> জীবনের পাঠ নিয়ে দেখতে হবে সত্যটা আছে কোথায়।
> আমাকে জানতেই হবে মোল্লারা যা বলে তার কতখানি সত্য,
> আর কতটা মনগড়া।
> বা, ওরা যা বলে তা আমার বেলায় খাটে কিনা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৫)

বিদ্যমান সমাজে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মাপকাঠিও নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করেছে পুরুষ। ফলে সেখানে নারীর স্বার্থ বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। সংসারে তাই নারীর স্বাধীন জীবনমান-আকাঙ্ক্ষা পুরুষের কাছে অনুচিত বলেই বিবেচিত হয়। বস্তুত, যে সমাজের বিধি-বিধান পুরুষ স্বীয় স্বার্থে তৈরি করেছে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কিংবা স্বাধীনচারী মনোবৃত্তি সেখানে অন্যায় ও অবান্তর। কিন্তু নারী আজ কেবল পুরুষের চোখে নয়, বরং নারীর চোখে সমাজকে দেখতে চাইছে :

> নারীর কোনো নিজস্ব মত পথ নেই এ সমাজে।
> একবার নারীর চোখ দিয়ে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো,
> দেখে বোলো—তোমরা যে চোখে দ্যাখো, সে চোখেই কি নারী দ্যাখে—
> কোনটা তার জন্যে ভালো আর কোনটা মন্দ? (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৬)

শিরদাঁড়া রুজু করে দীপ্রভঙ্গিতে তাই সে উচ্চারণ করেছে :

> স্ত্রী। শুনেছি কারো স্ত্রী যখন স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যায়, যেমন আমি যাচ্ছি,
> সমাজ বলে, তখন স্বামী সব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
> সমাজ পড়ে থাক, আজ আমিই তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে যাচ্ছি।
> আমাদের কারো কোনো দায় দায়িত্ব আর নেই কারো প্রতি।
> দুজনেরই এখন পূর্ণ স্বাধীনতা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৮)

তবে *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন, ইবসেন রচিত নাটকের নোরার যাপিত-জীবন ও সমাজব্যবস্থা এখন আর সেবকম নেই; সময়ের ব্যবধানে মানবভাবনায়ও অনেক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু নারীসম্পর্কিত ভাবনার অনেক কিছুই এখনও বহাল রয়েছে। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী এখনও অসহায়। পুরুষের পক্ষে যে-কাজটি স্বাভাবিক, নারীর জন্য তা এখনও অশোভন ও অকল্পনীয়। আলোচ্যমান নাটকেও দেখা যায়, রাত্রি-নিশীথে জনমানবশূন্য রেলস্টেশনে নারীকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রৌঢ় চরিত্রটি বিস্মিত হয়েছে; তার নিরাপত্তা ভাবিত হয়েছে এবং সম্ভাব্য সামাজিক পীড়ন ও প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সতর্ক করে বলেছে :

> প্রৌঢ়। একা নারী। দিনের বেলাতেই পথে ঘাটে তাকে কত সামলে
> চলতে হয়।
> আর রাতে? পথে প্রান্তরে, শহরে বিরানে—নারীর জন্যে ওঁৎ
> পেতে আছে ভয়।
> আর সেই আপনি কিনা, দিনে নয়, রাতে, নিশুতি রাতে—একা?
> একা বেরিয়ে পড়লেন? একেবারে একা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫২২)

নাটকের প্রারম্ভদৃশ্যেও নারীকে দেখে প্রৌঢ়ের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। প্রৌঢ় চরিত্রটি অবাক চোখে ভেবে নিয়েছে এ হয়তো মানবী নয়; দেহাতি বা অশরীরী কিছু। কেননা আবহমান সামাজিক বিধিব্যবস্থা তার মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যে, একেলা নারীর পক্ষে রাত্রিনিশীথে বাইরে থাকা অশোভন ও অন্যায়। কিন্তু যখন সে নিশ্চিত হয় যে, এ একজন সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ; তখনই তার মাথায় আসে এ নারী হয়তো সমাজবঞ্চিতা, গৃহহীন, অসহায়! ফলে প্রথমেই সে কৌতূহল ও সমবেদনা নিয়েই নারীটির সঙ্গে আলাপে মগ্ন হয়েছে। এসময়ে নারীকে উদ্দেশ্য করে প্রৌঢ়ের যে উক্তি তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ভেবেছিলাম দেহাতি কেউ। [...]
> আপনি যে পুরুষ নন, সেটাও চোখে পড়লো।
> একটু অবাক হলাম। ভাবিনি আপনার মতো কেউ
> এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। [...]
> মানে, একা একজন মহিলা,
> অন্ধকারে, নিশুতি রাতে, প্লাটফরমের বাইরে,
> পুরুষ হয়ে কতক্ষণ চোখে দেখা যায় বলুন। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৪)

অপেক্ষমাণ নাটকের নারীচরিত্র সামাজিক এই বিধিব্যবস্থা সম্যক অবগত। তাই তার খেদোক্তি:

> নারী। নারী নেবে সিদ্ধান্ত? নারীকে তো সিদ্ধান্ত দেয়া হবে!
> আর নারী সেটা মেনে নেবে—বিনা প্রশ্নে, বিনা তর্কে! তাই না? (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৮)

ইবসেন-রচিত নাটকে নোরার সশব্দে দরোজা বন্ধ করে স্বামীগৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি সেকালের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একান্তই বৈপ্লবিক। সংসারী নারী উপভৌগিক সমস্ত সুবিধা পেয়েও কেবল আত্মমর্যাদার প্রশ্নে এতটা দ্রোহী হতে পারে, সেটি ছিল সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অকল্পনীয়। বলাবাহুল্য, এরকম একটি নাটক লেখার জন্য হেনরিক ইবসেনকে কট্টরপন্থীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। আত্মমর্যাদাবোধে তাড়িত হয়ে নোরাই যে গৃহত্যাগের মতো দুঃসাহসী ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছিল, সেটি সৈয়দ শামসুল হক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তবে তিনি এও জানতেন এই ঘুণেধরা প্রাচীন প্রথার পরিবর্তন কোনও একক প্রয়াসে সম্ভবপর নয়। তবু নোরার এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ়ের মুখের

সংলাপে নাট্যকারের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রৌঢ় এবং নারী চরিত্রের প্রাসঙ্গিক কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে :

নারী। দরোজাটা ভেঙেই ফেলেছি কিনা?
প্রৌঢ়। না, না। ভাঙা অত সহজ নয়।
এ তো আর আজকের দিনের হালকা পল্কা দরোজা নয়।
ওক কাঠের দরোজা, ঊনবিংশ শতাব্দীর। কঠিন!
নারী। সমাজটার মতোই!
প্রৌঢ়। ঠিক বলেছেন। কঠিন ছিলো সমাজ। [...]
কিন্তু এখন আর তেমনটা নেই।
ভাঙতে শুরু করেছে। বদলাতে শুরু করেছে। বদলাচ্ছে। [...]
আপনার ওই বেরিয়ে আসাটা ছিলো বৈপ্লবিক।
দরোজা খুলে দড়াম করে বন্ধ করাটা ছিলো একটা প্রতীক। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২১)

অন্যদিকে, হেনরিক ইবসেনের *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকটি পুরোপুরি সামাজিক নাটক। সৈয়দ শামসুল হক এ নাটকের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বাঙালি সমাজের অদ্ভুত মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। যে কারণে তিনি যখন ইবসেন থেকে ভাষান্তর করে *অপেক্ষমাণ* নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন একবারের জন্যও মনে হয়নি যে, এটি ভিনদেশি কোনো নাট্যকারের রচিত শতবর্ষ অতীতের ঘটনা; বরং দর্শক এ কাহিনির সঙ্গে এতটাই আত্মিক টান অনুভব করেন, যেন মনে হয়—এ তো এদেশেরই ঘরের গল্প; এ যে বাংলাদেশের অস্থির ও মেরুদণ্ডহীন, সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতিচিত্র। ইবসেনের নাটকে ঝরনা প্রকল্প নষ্ট হয়েছে ট্যানারির বর্জ্য দূষণে; স্বীয়স্বার্থে ও ক্ষমতার দম্ভে যেটিকে আড়াল করতে চেয়েছেন নগরের মেয়র পিটার। এর সঙ্গে রাজধানী ঢাকার হাজারিবাগের ট্যানারি শিল্প আর বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণচিত্র অনায়াসেই মেলানো যায়। এদেশের অধিকাংশ সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও এরকম দুর্নীতিতে আমূল আবদ্ধ। ঢাকার ওয়াসা (Water Suply And Sewarage Authority) ও নগর ভবনও (City corporetion) জনগণকে বিভ্রান্তমূলক তথ্য দিয়ে নিজেদের অপকর্মের পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই গায়। ফলে ইবসেনের এ কাহিনি যেন বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের কাহিনি।

রক্ষণশীল পশ্চাৎপদ সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা প্রথাবিরোধী ও ভিন্নমত একেবারেই গ্রহণ করতে পারে না। *অপেক্ষমাণ* নাটকে পৌরপিতার চরিত্রের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে। ডাক্তার যখন নদীদূষণের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে, পৌরপিতা নিজের দোষ আড়াল করে জনমনে ডাক্তার সর্ম্পকে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে বলেছে :

পৌরপিতা। আমি একটা ভিতরের কথা বলি। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে—
এই ডাক্তার—একটা বাজে হুজ্জত তুলে—এই আমার ভাই—
আপনাদের মন খুশি করা কিছু কথা বলে—
আগামী নির্বাচনে—শহরের পৌরপিতা হতে চায়—আপনাদের ভোটে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৬)

পৌরপিতার এই কূটকৌশলী ও দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়ে নির্ভীক ডাক্তার তার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে বলেছেন :

ডাক্তার। ইতিহাস আরো একবার দেখছে,
কয়েকজন মুনাফাখোর লুটেরা সত্যকে কীভাবে বিকৃত করছে।
সত্যবাদীকে কীভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।
আর, বিত্ত আর সম্পদ আর ক্ষমতার লোভে

কীভাবে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে দলে টানা হয়েছে। ধিক। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৬)

বস্তুত, সমাজে এমন কিছু দৃঢ়চেতা মানুষ থাকেন যারা জীবনের সবটুকু দিয়ে সত্যের জন্যে লড়াই করে যান। সৈয়দ শামসুল হকের *অপেক্ষমাণ* নাটকের পুরুষ চরিত্রটি এমনই একজন নির্ভীক ও সত্যান্বেষী মানুষ। একটি নির্ভেজাল সত্যকে উন্মোচনের তাগিদ থেকে তিনি নিজ এলাকার জনগণ, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, সকলের সঙ্গে লড়াই করে বেরিয়ে এসেছেন সত্য উন্মোচনে। নাট্যকার ডাক্তার চরিত্রটির সমাজহিতৈষী মানসিকতা উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপে :

আমি প্রাইভেট প্রাকটিসে যাইনি, আমি সামান্য বেতনে চাকরি
নিয়েছি পৌরসভার—
যেন আপনাদের পাশে রোগেশোকে দাঁড়াতে পারি। [...]
ডাক্তারের কাজ শুধু রোগের চিকিৎসা করা নয়,
ডাক্তারের প্রথম কাজ—আমার বিবেচনায়—রোগের কারণ নির্মূল করা।
জনজীবনের নীরোগ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৯)

আবার, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদেরা নিজেদের স্বার্থে জনতাকে ব্যবহার করে। মুখে মুখে জনতাকে নিয়ে বড় বুলি আওড়ায়। কিন্তু নজর থাকে আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার দিকে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের এই কূটচাল ডাক্তার জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন—জনতা পুতুলমাত্র। কেননা সত্য-মিথ্যা যাচাই করার সক্ষমতা জনতার সবসময় থাকে না। ফলে সব ক্ষমতা থেকে যায় রাজনীতিবিদের হাতেই। ডাক্তার এবং পৌরপিতার সংলাপে সমাজ ও রাজনীতির এই গতিচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নরূপে :

পৌরপিতা। তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো? আমাদের অপমান করা?
আমরা জনতার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি?
জনতাই হচ্ছে আসল শক্তি—শক্তির উৎসই হচ্ছে জনতা।
ডাক্তার। এর চেয়ে বড় মিথ্যে আর কিছু নেই। দড়ি তোমাদের হাতে।
জনতা পুতুল—তোমরা নাচাচ্ছো। যেমন নাচাও, তেমনি নাচে!
শক্তি তাদেরই হাতে যারা সত্যমিথ্যা বিচার করতে পারে,
ভালোমন্দ স্পষ্ট করে নির্ণয় করবার ক্ষমতা রাখে।
আর, ভালোমন্দ বা সত্যমিথ্যা নির্ণয় করবার জন্যে চাই তথ্য—
পর্যাপ্ত শুধু নয়, সকল তথ্য, সব তথ্য,
আর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করবার মতো মেধা।
জনতা তো একটা ধারণা মাত্র—
জনতার ভেতরে একটি একটি করে মানুষ।
সেই একটি একটি মানুষের সবারই কি আছে একই মাপের মেধা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

কিন্তু ডাক্তারের এ সংলাপের পরেও শোনা গেছে পৌরপিতার দাম্ভিক স্বৈরতান্ত্রিক স্বর :

পৌরপিতা। আমাদের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ করছেন উনি!
এতবড় অভিযোগ এনে তুমি পার পাবে না।
এ শহরে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩২)

রাজনীতিবিদের এই অপকৌশল সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হক আমাদের সোচ্চার করেছেন নারীচরিত্রটির মাধ্যমে উচ্চারিত অপর একটি সংলাপে :

মিথ্যাচারের কথা বলুন।
তিক্ত সত্যকে মিথ্যার মিষ্টি মোড়কে গেলবার কথাও বলুন। [...]
মিথ্যা গিলিয়ে জনসাধারণকে মৌতাতে ফেলে
সমাজকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা!
আপনি তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৪)

আবার, আলোচ্যমান নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রটির উক্তির মাধ্যমে ইবসেনের দুটি নাটকের সামাজিক বাস্তবতার মূলসার উঠে এসেছে নিম্নরূপে:

প্রৌঢ় । আপনি সংসারে নারী অবস্থান —
আসল তার রূপ—কোটি কোটি সংসারে—
সারা পৃথিবীতে, প্রতিটি সমাজে—
আপনার ব্যাক্তিগত জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে—
সব নারীর হয়ে—উপলব্ধি করেছেন। [...]
আর আপনি—আপনি তো
একটা শহরের পরিস্থিতির ভেতরে উপলব্ধি করেছেন—
ক্ষমতা আর সম্পদের লোভে গুটিকয় মানুষ—ওপরতলার কিছু মানুষ—
কীভাবে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে—
তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েও—
কীভাবে ক্ষমতাধরেরা তাদের আসন পাকা করে—
সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে! (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৬)

ঈর্ষা নাটকের প্রৌঢ় যখন মনে করেছে অপর দুই চরিত্রের সমাজঘনিষ্ঠ কাহিনির ভেতরে তারও কাহিনি নিছকই ব্যক্তিগত, তখন পুরুষ চরিত্রটি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে—ব্যক্তিও সমাজের অংশ। তাই তার জীবনবাস্তবতাও প্রকারান্তরে সামাজিক বাস্তবতা।

পুরুষ। কে বলে মূল্য নেই! ব্যক্তি ব্যক্তি ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ।
বিন্দু বিন্দু পানি নিয়েই তো সাগর! একটি একটি ফুল নিয়েই উদ্যান! [...]
জীবনের প্রতারণা যদি শিল্পে ছায়া ফেলে—
শিল্প তো সমস্ত মানুষ—গোটা একটা সমাজ—
মানুষ আর সমাজের জন্যেই;
শিল্পে প্রতারণা থাকলে সমাজটাকেই তো প্রতারণা করা হয়। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৭)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্যমান নাটকে ইবসেনের পথে হেঁটেই সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতি, অন্যায়, অনাচার তুলে ধরেছেন। হেনরিক ইবসেন তাঁর বাস্তববাদী ধারার নাটকের মাধ্যমে যেমন সমাজের সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার, যাজকশ্রেণির অন্যায় আচরণ ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছিলেন; নারীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, মালিকশ্রেণির শোষণ ও নিষ্পেষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে জনগণের শুভচেতনা জাগ্রত করে সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

দুই

বস্তুত *অপেক্ষমাণ* নাটকের চরিত্রায়ণ কৌশল সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য কাব্যনাটকের তুলনায় স্বতন্ত্র। এখানে একটি চরিত্র বহুস্বরের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইবসেনের নাটকের চরিত্র সৈয়দ হকের নাটকের চরিত্র বনে গেছে। আবার, সৈয়দ হকের নির্মিত চরিত্র ইবসেনের নাটকের চরিত্রে অভিনয় করেছে। চরিত্রের এমন মিথস্ক্রিয়া নাটকটিকে দিয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। আবার, একটি চরিত্র একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করায় অল্পসংখ্যক কুশীলব নিয়ে নাটকটির সফল মঞ্চায়ন সম্ভবপর হয়েছে; একটি নাট্যপ্রযোজনার জটিল প্রক্রিয়ায় যেটি ইতিবাচক দিক। এরপর আবার নাটকের শেষে আকস্মিকভাবে নাট্যকারদের মঞ্চে উপস্থিতি দর্শকদের মাঝে যেমন সাড়া জাগিয়েছে, তেমনি নাটকটির আঙ্গিককে অভিনব করে তুলেছে। নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকারদের এমন উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টিতে বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাসে বোধ হয় আর ঘটেনি; সেদিক দিয়েও এ নাটকটির মধ্যে নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়।

সৈয়দ শামসুল হক সঙ্গত কারণেই ইবসেনের মূলরচনা থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ নাটকে চরিত্র সংযোজন করেছেন। যেমন : ইবসেন রচিত *এ ডলস হাউস* নাটকের প্রধান চরিত্র সংখ্যা পাঁচ—তরওয়ালড হেলমার, তার স্ত্রী নোরা, নোরার বন্ধু মিসেস লিনদ, হেলমারের বন্ধু ডাক্তার র‍্যাঙ্ক ও নিলস ক্রগস্তাদ। এছাড়া নাটকে গৌণ কিন্তু অপরিহার্য চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে আরও কিছু চরিত্র; এরা হলো হেলমার-নোরার তিন সন্তান, তাদের ধাত্রী অ্যান, গৃহপরিচারিকা ও কুলি চরিত্র। তবে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে কেবল নোরা ও তার স্বামী হেলমারের সক্রিয় উপস্থিতি ও কথোপকথন যুক্ত করেছেন। এছাড়া পরিপ্রেক্ষিতকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যও বেশকিছু চরিত্রের পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সংখ্যা এগারো। এরা হলো নাটকের প্রধান চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান, তার স্ত্রী মিসেস স্টকম্যান, ছেলে মর্টেন ও ইয়েলিফ, ডাক্তারের স্কুল শিক্ষিকা কন্যা পেট্রা, ডাক্তারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নগরপিতা পিটার স্টকম্যান, ডাক্তারের শ্বশুর মর্টেন কিল, পত্রিকার সম্পাদক হোভস্টাড, পত্রিকার সম্পাদনা সহকারী বিলিং, পত্রিকার প্রকাশক আসলাকসেন ও ডাক্তারের প্রকৃত নিঃস্বার্থ নাবিক-বন্ধু ক্যাপ্টেন হরস্টার। এছাড়াও নাটকের প্রয়োজনীয় ক্লাইমেক্স তৈরিতে একজন মদ্যপ মাতাল এবং শহরের বেশকিছু জনচরিত্র ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে মূলরচনার সবচরিত্র গ্রহণ করেননি। তিনি কেবল প্রধানতম চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান, খল চরিত্র মেয়র পিটার স্টকম্যান, ডাক্তারের স্ত্রী চরিত্র নিয়ে নাটকের কাহিনি সাজিয়েছেন। অন্যাদিকে, তাঁর স্বরচিত নাটক *ঈর্ষার* মূল নাট্যকাহিনিতেও মাত্র তিনটি চরিত্রেরই শরীরী উপস্থিতি ছিল : প্রৌঢ় শিক্ষক চরিত্র, যুবক শিক্ষার্থী এবং যুবতী। চরিত্রসংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে *অপেক্ষমাণ* নাটকের ক্ষুদ্র পরিসরেও তাদের তিনজনেরই উপস্থিতি রেখেছেন নাট্যকার। আবার আলোচ্যমান নাটকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন কিছু চরিত্র এনেছেন। যেমন—স্টেশন মাস্টার, কুলি, ব্রেকডান্সারের দল, কেরানি প্রভৃতি। বস্তুত, তিনটি নাট্যকাহিনিকে একই ক্যানভাসে উপস্থাপনের প্রয়োজনে সৈয়দ শামসুল হক মূলনাটকে চরিত্রের এমন সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এতৎসত্ত্বেও মূল নাটকের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেনি।

অপেক্ষমাণ-এর নাট্যকাহিনি শুরু হয়েছে কোরাস চরিত্রের মাধ্যমে; নিশুতিরাতে রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে। কোরাসে নাট্যকার যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তারা উক্ত স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, কুলি এবং কেরানি। এরাই বিভিন্ন সময়ে নাটকের প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। এরাই কখনো ব্রেকডান্সারের দলভুক্ত হয়ে নাটকের মূলসূত্র দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে, কখনো *এন এনিমি অব দ্য পিপলের* জনগণের ভূমিকা পালন করেছে, আবার কখনো কখনো দৃশ্যানুযায়ী মঞ্চসজ্জার কাজে ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ কোরাসকে সৈয়দ শামসুল হক নাট্যপরিবেশনায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন। কোরাসের এই

বহুমাত্রিক উপস্থাপনা বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে অভূতপূর্ব ঘটনা। নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকের প্রারম্ভে যে মঞ্চনির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেখানেই কোরাসের এমন বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছেন :

> শূন্য মঞ্চ। অন্ধকার মঞ্চের ওপর প্রথমে কয়েকটি তীব্র আলোর বৃত্ত নাচানাচি করে। তার কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে প্রবেশ করে ব্রেকডান্সারের দল। এরা আসলে স্টেশনের মাস্টার, কুলি ও কেরাণীর দল। গায়ে সেই রকমেরই ইউনিফর্ম, কিন্তু তাদের হাতে ধরা নাটকের ট্রাজেডি ও কমেডির একটি করে মুখোশ। এরা কোরাসের ভূমিকা পালন করবে—দৃশ্যের প্রয়োজনে মঞ্চ সাজাতে আসবে। সঙ্গীতের সঙ্গে তারা ব্রেকডান্স শুরু করে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০১)

মূলত, প্রাচীন গ্রিক নাট্যকলায় নাট্যকারগণ কোরাসের ভূমিকাকে যেভাবে নাটকে প্রদর্শন করেছেন, সৈয়দ শামসুল হক তা আত্তীকৃত করে তার মধ্যে নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকে কোরাসের বহুমাত্রিক ভূমিকা নাটকটির মঞ্চপ্রদর্শনকে যেমন সহজতর করে তুলেছে, তেমনি চরিত্রাধিক্যের জটিলতা থেকে নাটকটিকে মুক্ত করেছে।

অপেক্ষমাণ শুরু হয়েছে রেলওয়ের প্লাটফর্মে তিনটি নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে; তারা নিজেরাই প্রসঙ্গক্রমে নিজেদের বর্তমান চরিত্র বদলে ফিরে গেছে অতীতে এবং দর্শকদের সম্মুখে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বেদনাদায়ক কাহিনি অভিনয়কলার মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। নাটকের প্রৌঢ়চরিত্র কখনও হয়ে উঠেছেন সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকের প্রবীণ অধ্যাপক, কখনও হয়েছেন *এ ডলস হাউস* নাটকের নোরার স্বামী হেলমার, আবার কখনও *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের খলচরিত্র নগরপিতা পিটার স্টকম্যান। নাট্যসমাপ্তিতে আবার তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রে। তবে মূল *ঈর্ষা* নাটকে যে অসূয়াকাতর প্রৌঢ় শিল্পীকে দেখা যায়, যিনি স্বীয় শিল্পচর্চা আর জৈবিক প্রয়োজনে নিজের ছাত্রীকে ব্যবহার করেছেন, আবার শিল্পকর্মের আদর্শানুসারী না হওয়ায় জনৈক প্রতিভাবান ছাত্রকে পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দিয়েছেন; সেই ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাকাতর প্রবীণ শিল্পী *অপেক্ষমাণ* নাটকে এসে ইতিবাচক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। *ঈর্ষা* নাটকে যেখানে তিনি ছিলেন হতাশায় মজ্জমান ব্যর্থ প্রেমিক সত্তা এবং যিনি তাঁরই প্রেমাস্পদ ছাত্রীর বিবাহিত জীবনকে তছনছ করে দেবার হুমকি দিয়ে বলেছিলেন :

> এত ঘৃণা? অসহ্য এতই? এতই দূরত্ব আজ? [...]
> দু'জনের মাঝখানে একটি যুবক আজ?
> প্রতিদ্বন্দ্বী এখন যুবক—আমারই একজন ছাত্র? [...]
> সে তোমাকে নগ্ন করে দেখেছে কি? এরই মধ্যে শোয়া হয়ে গেছে? [...]
> আহ্, আ, আ, কি যে ক্রোধ হচ্ছে আমার।— ক্রোধ। হাঁ, হাঁ, ক্রোধ। (শামসুল, ২০১৬ : ৩২০)

অথচ এই ক্রোধে মত্ত, প্রতিশোধে উন্মুখ প্রবীণ অধ্যাপক *অপেক্ষমাণ* নাটকে এসে শান্ত, স্থিত ও প্রজ্ঞাবান চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। অন্তরের যাবতীয় পাপাচার, অশুদ্ধতা ধুয়ে-মুছে এ যেন তাঁর নবতর সত্তায় আত্মোদ্বোধন। তবে *ঈর্ষা* নাটকেও প্রৌঢ়ের আত্ম-অনুশোচনার ইঙ্গিত ছিল। তবে সেটি ছিল কিছুটা ধোঁয়াশাপূর্ণ। সেখানে একবার তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়েটির সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে শরীরী সম্পর্কে যাওয়া তাঁর উচিত হয়নি, কেননা প্রতারণা ও মিথ্যাচার যাবতীয় শিল্প ও সুন্দরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর যাই হোক মিথ্যে দিয়ে, চাতুরি দিয়ে সত্য, সুন্দর ও শিল্পের পূজা সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মন ও শরীর মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। *ঈর্ষা* নাটকের শেষে প্রৌঢ়ের সংলাপগুলো বিচার করলে সেটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঈর্ষাকাতর প্রেমিকের মতোই তিনি সন্দেহ করেছেন

মেয়েটি হয়তো যুবকের সঙ্গেই অন্য কোথাও মিলিত হচ্ছে। তাকে ফেরানোর আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে তিনি বলেছেন :

> কোথায় সে? কোথায়? তুমি আছো কোথায়? [...]
> তুমি, তুমি, রক্তমাংসে যে তুমি, আমি সেই তোমাকে চাই।
> আমার ক্যানভাস হোক অমর, তোমার নদীতে আমি মরতে চাই। (শামসুল, ২০১৬ : ৩৬৮)

অথচ *অপেক্ষমাণ* নাটকে এই কামে, ক্রোধে উন্মত্ত প্রৌঢ় চরিত্রটি বিস্ময়করভাবে বদলে গেছেন। নারীর শরীর নিয়ে শিল্পচর্চা আর তাঁর আরাধ্য নয়; বরং প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য উপভোগ করে তাকে স্বীয় ক্যানভাসে অমর করে রাখাই এখন তার অন্বিষ্ট।

ঈর্ষা নাটকে যুবক ছাত্রের পছন্দ ছিল প্রকৃতির রূপলাবণ্য ও বাস্তবদৃশ্য নিয়ে ছবি আঁকা। প্রৌঢ় চরিত্রটি মত্ত ছিলেন ন্যুড আর বিমূর্ত চিত্রকলায়; প্রকৃতির ছবি আঁকা একটা সময় তার কাছে মনে হতো শিল্পের নয় বরং ক্যামেরার চোখ দিয়ে সৌন্দর্য-অবলোকন। কিন্তু অন্তরের ঈর্ষা আর পঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলে শুদ্ধতম সত্তায় উন্নীত হয়ে তিনি এখন ছুটে চলেছেন দূরের কোনো গ্রামে; যেখানে অবারিত মাঠের প্রান্তে আকাশের কোলে টুপ করে ডুবে যায় দিনান্তের রক্তিম সূর্য; কিংবা খরায়, বন্যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন ফসলের খেতে উদীয়মান সূর্যের মনোলোভা ছবি। রেলস্টেশনে দেখা পাওয়া যুবতী নারীকে (যেন *এ ডলস হাউসের* নোরাকে) উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, এ রেল স্টেশনে বসে অপেক্ষা করা কেবল নিছকই রেলে চেপে গন্তব্যে প্রস্থানের জন্য নয়; বরং এ অপেক্ষা দিন বদলের। কালোকে ধুয়ে মুছে আলোতে পরিবর্তন করার। প্রতারণা থেকে বেরিয়ে এসে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করার। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ় চরিত্রটিই নোরা ও ডাক্তারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যকে একাকার করে ফেলেছেন। অর্থাৎ সে-ই তিনটি চরিত্রের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যকে একই ফ্রেমে বেঁধেছেন। বস্তুত প্রৌঢ় চরিত্রটিই এখানে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের প্রতিনিধি হয়ে তিনটি নাটকের সারকথা দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। নারীচরিত্রটি অর্থাৎ নোরা যখন নাটক শেষে বলে উঠেছে আমাদের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা বোধ হয় শেষ হতে যাচ্ছে; তখন পুরুষ চরিত্রটি অর্থাৎ *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্রটি বলেছে—এ অপেক্ষার শেষ কেবল ট্রেনে চড়ে যাবার জন্য নয়, এ অপেক্ষার শেষ দিন বদলের। প্রৌঢ় চরিত্রটির উচ্চারিত সংলাপে সেই বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> প্রতারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু শুরু করবার।
> ব্যক্তির জীবনের প্রতারণা।
> জনতাকে প্রতারণা।
> সংসারের প্রতারণা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

এখানে ব্যক্তির জীবনের প্রতারণা বলতে প্রৌঢ় নিজের জীবনের কথা বলেছেন। কেননা তিনি শিল্পচর্চার নামে ছাত্রীর ন্যুড এঁকে, তাকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, তেমনি শিল্পকে করেছেন অমর্যাদা। তার অদূরদর্শী ও হীন তৎপরতায় তছনছ হয়ে গেছে দুজন সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীর জীবন। এই সত্য উপলব্ধি করেই তিনি এখন আত্মাকে শুদ্ধ করতে চাইছেন। অন্যদিকে, জনতাকে প্রতারণার কথা বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের কাহিনি-অন্তর্গত নগরপিতার কথা। যিনি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য স্বীয়ভ্রাতা ডাক্তার স্টকহোমকে প্রতারিত করেছেন। চরিত্রটি কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে জনতাকে ঠকাতে চাননি। শহরের পানিতে বিষক্রিয়ার কথা তিনি নির্দ্বিধায় জনগণকে অবহিত করেছেন। অথচ বিষয়টি চেপে গেলে তিনি নিজভ্রাতা নগরপিতাকর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারতেন। বরং সে সত্যে অবিচল থেকে সত্যকে প্রচারের জন্য সব হারিয়ে তিনি আজ পথে নেমে এসেছেন। যে জনতা তাকে ভুল বুঝে শহর ত্যাগে বাধ্য করেছে, সেই জনতার

স্বার্থরক্ষায় তিনি আজ পথে পথে। আবার সংসারের প্রতারণা বলতে প্রৌঢ় *এ ডলস হাউসের* নারীচরিত্র অর্থাৎ নোরাকে বুঝিয়েছেন। কেননা পুরুষশাষিত সমাজের প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে সেও জীবনানন্দে স্থিত হতে চেয়েছে। দিনবদলের এই জয়গানের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রৌঢ় চরিত্রের সংলাপে :

> হ্যাঁ, আমি সেই প্রান্তরে যাচ্ছি—
> খরায় উজাড় হয়ে যাওয়া মাঠে—সূর্য উঠছে—আঁকতে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

অপেক্ষমাণ নাটকের প্রারম্ভে তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক আলাপের সূচনাও ঘটেছে *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের উদ্যোগে। নইলে ইবসেন নির্মিত চরিত্র নোরা এবং ডাক্তার স্টকম্যান তারা দুজনেই ছিলেন নিজেদের চিন্তায় আত্মমগ্ন, বিভোর। আশেপাশের ব্যক্তি বা পরিবেশ নিয়ে তাদের আগ্রহ ছিল না। নোরার এই আত্মমগ্নতা নাট্যকার মঞ্চনির্দেশ অংশে একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি নোরাকে বলেছেন ছায়ামূর্তির মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা নারী, যার বসনপ্রান্ত হাওয়ায় উড়ছে। এমনকি প্রৌঢ়ব্যক্তি তাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে কুশল বিনিময়ের জন্য এগিয়ে গেলেও নোরা তখনো তাকে লক্ষ করে না। প্রৌঢ়ের সংলাপ এবং নোরার প্রতিক্রিয়ার যে মঞ্চনির্দেশনা নাট্যকার দিয়েছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ়ের প্রথম সংলাপ ও নারী চরিত্রের প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ :

> প্রৌঢ়। এই যে—শুনছেন?
> নারী উত্তর দেয় না। যেন সে শোনেই নি।
> প্রৌঢ় এবার আর একটু কাছে এগিয়ে যায়।
> প্রৌঢ়। আপনি কি যাত্রী? ট্রেন আসবার বেশ দেরী আছে কিন্তু।
> নারী এবারও কোনো উত্তর করে না বা সাড়া দেয় না। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৪)

এরপর প্রৌঢ় হাল না ছেড়ে আবারো বারোটি বাক্যসংবলিত একটি দীর্ঘ সংলাপ বলে নারীটিকে বাক্যালাপে আগ্রহী করে তুলতে চায়। এ পর্যায়ে মঞ্চে প্রথম নারীচরিত্রটি অর্থাৎ নোরার প্রথম সংলাপ শুনতে পাওয়া যায়, তবে সেটিও নারীর স্বাভাবিক চপলতাসুলভ নয়; বরং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ একটি মাত্র বাক্যের সংলাপ : "আমি এখানেই ভাল আছি।" কিন্তু বারংবার প্রৌঢ় চরিত্রটির উত্থাপিত নানান প্রসঙ্গ এবং বাক্যালাপের আন্তরিকতা একসময় প্রৌঢ়ের সঙ্গে তাকে আলাপে অনুপ্রাণিত করে তোলে। সে প্রথমে প্রৌঢ়ের জীবনকাহিনি শ্রবণ করে। এরপর ধীরে ধীরে সে নিজের জীবনকাহিনি উন্মোচিত করে। অবশেষে তাদের এ আলাপে নিজে থেকেই যুক্ত হয় ওয়েটিং রুমে অপেক্ষারত অপর পুরুষ চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান। উল্লেখ্য এখানে স্পষ্টত প্রৌঢ়ের একক আগ্রহেই রেল স্টেশনে অপেক্ষারত তিনটি পৃথক চরিত্র একীভূত হয়ে তাদের জীবনের গল্পগুলো বিনিময় করে। একটু বিবেচনা করলে বোঝা যায়, প্রৌঢ় ব্যক্তির এমন উদ্যোগী হয়ে আলাপ জমানোর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক নিজেই যখন উদ্যোগী হয়েছেন আর্ন্তজাতিক ইবসেন নাট্যোৎসবে এ চরিত্রগুলির সম্মিলনের, সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের রচিত নাটকের চরিত্র উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে সেটিই স্বাভাবিক। আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে—যেহেতু তিনটি চরিত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী প্রৌঢ় চরিত্রটি। তাই বয়সের অভ্যাস অনুসারে প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ধরে নিয়েই নাট্যকার অত্যন্ত কুশলী হয়ে প্রৌঢ়ের সঙ্গেই নোরার প্রথম আলাপ জমিয়েছেন। অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হক স্পষ্টত *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের তুলনায় *অপেক্ষমাণ* নাটকে আলাপি স্বভাবের এক প্রৌঢ় চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্রটির ইতিবাচক পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত তিনি *ঈর্ষা* নাটকে রেখে এসেছিলেন, তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছেন আলোচ্যমান নাটকে।

অন্যদিকে নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকে নারী ও পুরুষ নামে যে চরিত্রদুটির চিত্রণ ঘটিয়েছেন, তা পুরোটাই ইবসেন নির্মিত চরিত্রের প্রতিরূপ। যেহেতু তিনটি নাটককে সমীকৃত করে একটি নাটক রচনা করতে হয়েছে তাঁকে, তাই নাট্যরস ধরে রাখতে এবং সংহত অবয়ব প্রদানের প্রয়োজনে তিনি ইবসেনের চরিত্রদুটিকে বিস্তৃত আকারে গ্রন্থিত করেননি। তবে চরিত্রদুটির যে আংশিক ঝলক এবং দৃঢ়তা তিনি নাটকে উপস্থাপন করেছেন তাকে ইবসেন নির্মিত ডিটেইলস চরিত্রের সারবত্তা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

নারীচরিত্রটি ইবসেনের নোরা চরিত্রের বাইরে *ঈর্ষা* নাটকের ছাত্রীর ভূমিকাতেও অভিনয় করেছে। তবে শেষাবধি ফিরে এসেছে নোরা চরিত্রেই। *এ ডলস হাউস* নাটকে নোরা চরিত্রটির একটি রূপান্তর দেখিয়েছেন নাট্যকার ইবসেন। যেমন : নাটকের প্রাথমিক অঙ্কে নোরার যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাতে তাকে আমুদে, চলচপলা, স্নেহশীল মাতা ও একনিষ্ঠ পত্নী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তার মিষ্টি চিনেবাদাম খাওয়া স্বামীর পছন্দ নয়। তাই সে লুকিয়ে নিজের ভীষণ পছন্দের বাদাম খায়, প্রকাশ্যে স্বামীকে নিজের পছন্দ সম্পর্কে বলতে পারে না বা বলে না। বরং স্বামীর জেরার মুখে সে মনে করে স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার কখনোই যাওয়া উচিত নয়, হোক তা যতই সঠিক আর পছন্দের। হেলমার ও নোরার এতৎসংক্রান্ত সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

> হেলমার। তুমি কি আজ মিষ্টির দোকানে যাওনি?
> নোরা। না তো! একথা বলছো কেন? [...]
> নোরা। [ডানদিকে টেবিলের কাছে গিয়ে] তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়াটা আমার উচিত নয়।
> হেলমার। না, নিশ্চয় না। (সুনীল, ১৯৮৩ : ১২-১৩)

নোরার স্বামী যখন তাকে কথায় কথায় 'মেয়েছেলে' 'বেহিসেবী নারী' 'উড়নচণ্ডী' প্রভৃতি উক্তি করে তখন সে নীরবে সয়ে যায়, গায়ে মাখে না, বরং হেসে উড়িয়ে দেয়। আবার স্বামী হেলমার যখন তাকে ভালবেসে 'পক্ষীরাণী', 'ক্ষুদে কাঠবিড়ালী' প্রভৃতি প্রাণীবাচক বিশেষণ ব্যবহার করে, নোরা তখন সেগুলো সানন্দচিত্তে উপভোগ করে :

> হেলমার। আমার পক্ষীরানীর গলা নাকি?
> নোরা। হ্যাঁ, পক্ষীরাণীর। [...]
> হেলমার। আমার কাঠবিড়ালী বাড়ি ফিরলো কখন?
> নোরা। এইমাত্র। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৯-১০)

অথচ এই নোরাই কিছু ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অবশেষে পুরোপুরি বদলে যায়। সামাজিক প্রথা আর প্রচলন ভেঙে সে হয়ে ওঠে আত্মপ্রত্যয়ী নারী। যে সংসার, সন্তান ও স্বামী ছিল তার সার্বক্ষণিক ভাবনার, দৈনন্দিন কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, সে-সবকে পেছনে ফেলে সে নিজেকে আত্মানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষারত যে নারীর ছবি এঁকেছেন সে মূলত এই দৃঢ়প্রত্যয়ী নোরা। সে এখন আর সংসারের পুতুল নয়, পুরুষের খেলার বস্তু নয়। বরং সমাজে নারীপুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে সোচ্চার ও দৃঢ়কণ্ঠ। এই প্রত্যয়ের দীপ্তি তার অন্তরে ছিল বলেই সে রেলস্টেশনের অন্ধকারকে ভয় পায়নি; অচেনা পরিবেশে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেনি কিংবা ভয়বোধে আক্রান্ত হয়নি। বরং প্রৌঢ়ের আহবানের মুখে নিজের জীবনকাহিনি তাকে খুলে বলতে পেরেছে। নাটকের শেষে যখন প্রৌঢ় তাকে জানিয়েছে প্রতারণা ছেড়ে তার প্রকৃতিসম্ভোগে বেরিয়ে পড়ার কথা, তখন সেও তার গন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছে :

> নারী। আপাতত—যেখানে আমার জন্ম, সেইখানে।
> নতুন জন্ম আমি নিতে চাই। নারী নয়, ব্যক্তির জন্ম। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

এমনকি নারীচরিত্রটি তার এই নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নাটকের শেষ সংলাপ অবধি বজায় রেখেছে বা প্রমাণ করে গেছে। কেননা, *অপেক্ষমাণ* নাটকের শেষে যখন নাটকীয়ভাবে দুই দেশের দুই কালের দুজন নাট্যকারের সাক্ষাৎ ঘটে মঞ্চে, তখন প্রৌঢ় চরিত্রটি আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন—এই মহান নাট্যকারগণই তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নোরা সেটি মেনে নেয় না। সে বলে—নাট্যকারগণ তাদের সৃষ্টি করেননি, বরং তারাই নাট্যকার সৃষ্টি করেছে :

> প্রৌঢ়। আসলে ওই যে দেখছেন—ওঁরাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন!
> নারী। না! ভুল বললেন। আমরাই ওঁদের সৃষ্টি করেছি। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৫)

বস্তুত, নারীচরিত্রটির এমন দীপ্ত সংলাপের মাধ্যমে নোরার আত্মপ্রত্যয়ী রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে এখন পুরুষের ভুল শুধরে দেবার মতো সাহস সঞ্চার করতে পেরেছে। একজন নাট্যকার যেমন চরিত্রসৃষ্টি করেন, তেমনি ঘটনা কিংবা চরিত্রই যে প্রকৃতপক্ষে একজন কালজয়ী নাট্যকারের জন্ম অবশ্যম্ভাবী করে তোলে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে নোরার এই সংলাপে।

অপেক্ষমাণ নাটকের পুরুষ চরিত্রটি সৈয়দ শামসুল হক হেনরিক ইবসেনের *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন। ফলে এই চরিত্রের মধ্যে ইবসেন রচিত চরিত্র পুরোটাই মিশে আছে। সৈয়দ শামসুল হক আর সেখানে কোনও বদল আনেননি। ইবসেন যেমন একজন জনদরদি, প্রচণ্ড মেধাবী ও আবেগি ডাক্তার চরিত্র নির্মাণ করেছেন, সৈয়দ হকও এই চরিত্র নির্মাণে সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁর নাটকে প্রথম পর্যায়ে এ চরিত্রটিকে তিনি দেখিয়েছেন একজন ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আত্মভোলা মানুষ হিসেবে; যিনি অত্যন্ত তন্ময়চিত্তে ওয়েটিং রুমে ক্রমাগত পায়চারি করেই চলেছেন, সহযাত্রীর প্রতি তাঁর কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। তার উপস্থিতি তখনই জানা যায়, যখন প্রৌঢ় চরিত্রটি নারী চরিত্রটিকে ওয়েটিংরুমে বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন :

> আসুন, ওয়েটিং রুমে বসবেন।
> ওখানে আরো একজন আছেন।
> কষে তিনি পায়চারি করছেন সেই এসেছেন থেকে।
> অদ্ভুত ভদ্রলোক। একটি কথাও এ পর্যন্ত হয়নি।
> দু' একবার চেষ্টা করেছিলাম।
> চোখমুখ দেখে তেমন ভালো ঠেকলো না।
> তাই বাইরে বেরিয়েছিলাম। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৫)

একপর্যায়ে নারীটি সম্পূর্ণ একা স্বামীগৃহ ছেড়ে সত্তানুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে শুনে প্রৌঢ় চরিত্রটি যখন বিস্ময় প্রকাশ করে, তখন দেখা যায়, আত্মমগ্ন পুরুষ চরিত্রটি নারীটিকে সমর্থন করছে। এ পর্যায়ে কিন্তু চরিত্রটিকে আর আত্মভোলা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না; বরং সমাজসচেতন একজন সদালাপী, বাস্তববাদী মানুষ হিসেবেই তিনি দর্শকের সম্মুখে হাজির হয়। তিনি দূর থেকে এদের কথোপকথন শুনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন। তার সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সৌজন্যবোধ, সুরুচি, প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা :

> দুঃখিত, আমি দুঃখিত। একপাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনছিলাম।
> আশাকরি মনে কিছু করেননি। বা, বেমওকা হাজির হয়ে পড়িনি।
> শুনলাম আপনি পেইন্টার। অনেক কথা বোঝেন শোঝেন।
> কিন্তু আপনার কথাটার প্রতিবাদ না করে পারলাম না।
> একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না।

তবে, একা হয়ে ওঠাটাই যা মুশকিল।
সবাই পারে না। সবার কাছে একা মানেই—অসহায়।
আমার কাছে নয়। আমি এটা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২২)

তার সংলাপ শোনার পর প্রৌঢ় চরিত্রটির মনে হয়, তিনি হয়তো কবি সাহিত্যিক বা আত্মমগ্ন প্রকৃতির লোক। যে কারণে তিনি তাকে প্রাচ্যভাববাদ-চর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একলা চলা' বিষয়ক বিখ্যাত গানের পঙ্‌ক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানতে চান—তিনি কি ভাববাদে আস্থা রেখে দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দিতে চান! কিন্তু পুরুষ চরিত্র তখনি তাঁর ভ্রম সংশোধন করে বলেছেন—ভাববাদ নয়, বরং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি অবশেষে একলা থাকার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি তাই স্পষ্ট করে জানান :

না, অতটা কাব্য করে বলার বা দেখার লোক আমি নই।
আমি কঠিন বাস্তবের মানুষ।
সে হিসেবেই আমি নিজেকে গড়ে তুলেছি।
বাস্তবকে আমি বিচার করে দেখি, বিশ্লেষণ করে দেখি,
তারপর আমার কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
ওটা আমার সিদ্ধান্তের কথা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৩)

এরপর পুরুষ চরিত্রটি প্রৌঢ় এবং নারীচরিত্রটির কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নিজের জীবনের ট্র্যাজিক আখ্যান বর্ণনা করেন। হেনরিক ইবসেন তিনটি অঙ্কের বিস্তৃত পরিসরে যে নাট্যকাহিনি বেশকিছু চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, নাট্যকার সৈয়দ হক সেখানে পুরুষ চরিত্রের দীর্ঘ একটি সংলাপের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছেন। ইবসেনের মূল নাটকের যে অংশে নগরপিতা, ডাক্তার ও জনগণ মুখোমুখি হয়েছে সৈয়দ হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে সেখান থেকেই শুরু করেছেন। এদেশের মানুষ, সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি নাট্যকাহিনি ও চরিত্র সাজিয়েছেন। ইবসেনের নাটকে ডাক্তার চরিত্রটি যেমন দেশপ্রেমিক, নির্লোভ, সত্যান্বেষী, নির্ভীক চরিত্রের; *অপেক্ষমাণ* নাটকেও চরিত্রটি সেরকম। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা ও চরিত্রের বিবর্তন বা পুনর্নির্মাণ নয়; সৈয়দ হকের উদ্দেশ্য ছিল অতীতের বিখ্যাত নাট্যকারের বিখ্যাত চরিত্রকে সমকালের সমাজ, রাজনীতির সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন শতবছর পরেও সব কালে, সব দেশে, সব সমাজে হেনরিক ইবসেন কতটা প্রাসঙ্গিক।

আলোচ্যমান নাটকের পুরুষ চরিত্রটি ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্রের বাইরে আরও একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রৌঢ় যখন নিজের কাহিনি অভিনয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন তখন এ চরিত্রটি যুবক ছাত্রের ভূমিকা নিয়েছে। আবার নাটকের শেষপর্যায়ে মূলচরিত্রে প্রত্যাবর্তন করেছে। নাটকের শেষে আবারও তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় দৃঢ়প্রত্যয়ী দিনবদলের পথিক চরিত্ররূপে। তিনি জানেন তার প্রতীক্ষা কেবল ট্রেনের জন্য নয়, বরং—

অপেক্ষা পরিবর্তনের।
বদলের—সবকিছু বদলে যাবার। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৪৪)

ফলে তিনি ছুটে যেতে চেয়েছেন "শহরে শহরে গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরতে।" কারণ, তিনি জানেন সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না, সুযোগ নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হয়। যেমন গড়ে নিতে হয় নিজেই নিজেকে।

বস্তুত, "ইবসেনের নাটকগুলোর উপস্থাপন, চরিত্রায়ণ সাদামাটা হলেও সব মিলিয়ে এই সাধারণই একসময় অসাধারণ হয়ে ওঠে। নাটক যে সমাজকে উপস্থাপন করে, সেটিও নূতনভাবে দর্শকদের উপলব্ধি করান তিনি। ইবসেনের আগে নাটকে রাজা-রানি, বাদশা,

বেগম, সেনাপতি—অর্থাৎ বীর ও অভিজাত শ্রেণির চরিত্র চিত্রায়ণ করা হতো। কিন্তু জনজীবন উপস্থাপিত না হয়ে উপেক্ষিত থাকত। ইবসেন সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, সমাজস্থ অসংগতি ও নারীদের যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে" (ফরিদ, ২০১৬)। সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটকের চরিত্রনির্মাণ প্রসঙ্গেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। *অপেক্ষমাণ* কাব্যনাটকটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

তিন

হেনরিক ইবসেন তাঁর বিখ্যাত *এ ডলস হাউস* নাটকটি তিনটি অঙ্কের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু তার মধ্যেই যুক্ত করেছেন গ্রিক পঞ্চাঙ্ক নাটকের ব্যঞ্জনাসূত্র। অন্যদিকে তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকটিও রচিত হয়েছে তিনটি অঙ্কের কলেবরে। আবার *ঈর্ষা* নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে তিনটি চরিত্রের সাতটি বৃহৎ সংলাপের মাধ্যমে। সৈয়দ শামসুল হক অবশ্য *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রচলিত নাট্যফর্ম মেনে কোনও অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজনে যাননি। বরং একটি দৃশ্যের মধ্যেই পুরো নাটকটি সমাপ্ত করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন নাটকের চরিত্রগুলো এখানে কেবল সংলাপ প্রক্ষেপণের নান্দনিকতায় স্বকীয় হয়ে উঠেছে। তিনটি বৃহৎ কলেবরের নাটককে একই দৃশ্যে মঞ্চায়নের এমন অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) আয়োজিত ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে *অপেক্ষমাণ* নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়। নাটকটি প্রযোজনা করে *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়*; পরিচালনা করেন নাট্যজন আতাউর রহমান; তিনি এ নাটকটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র প্রৌঢ়ের ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এছাড়া এ নাটকের নারীচরিত্রে অভিনয় করেন অপি করিম ও যুবক ডাক্তার চরিত্রে অভিনয় করেন পান্থ শাহরিয়ার। বলাবাহুল্য পরিচালকের নির্দেশনার দক্ষতায় এবং অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাটকের এমন অনন্য সংমিশ্রণের অভিনবত্ব প্রত্যক্ষ করে ঢাকার দর্শক মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। এই জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় নাটকটি ২০১০ সালে মিশর আর্ন্তজাতিক নাট্যোৎসবে উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ পায়। এ সময়ে নাটকটির সমকালীনতা নিয়ে নির্দেশক আতাউর রহমান নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

> নাটকটির মধ্যে বর্তমান সময়ের অনেক কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এর আবেদন অনেক বেশি। এজন্য দর্শকের কাছে সহজে পৌঁছে যায়। গতবছর ঢাকায় ইবসেন নাট্যোৎসবে এর প্রথম মঞ্চায়ন হয়। তখন মিশরের শিল্পকলার একজন কর্মকর্তা ঢাকায় নাটকটি দেখে যান। তিনিই আমাদের নাটকটি নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল এ উৎসবে আমন্ত্রণ করেছেন। (আতাউর, ২০১০)

অপেক্ষমাণ নাটকের মঞ্চসফলতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন :

> আমার *রক্তকরবী* নাটকটি দেখে শম্ভু মিত্র মঞ্চে উঠে এসে তাঁর বিমোহিত হওয়ার কথা দর্শকদের সামনে জানিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, এ নাটকটিও তেমন একটি প্রযোজনা হবে। (আতাউর, ২০০৯)

অন্যদিকে, নাটকটির অন্যতম প্রধান চরিত্র নারীর ভূমিকায় অভিনয় করা নাট্যঅভিনেত্রী অপি করিম এ নাটকটিতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এক আলাপচারিতায় জানান :

> নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল গত বছরের নভেম্বরে। সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইবসেন উৎসবে। হেনরিক ইবসেনের দুটো নাটক *এ ডলস হউস* ও *অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল* এবং সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য *ঈর্ষার* সমন্বয়ে এ

নাটকটি রচনা করা হয়েছে। এ নাটকে আমি অভিনয় করেছি নোরা ও যুবতী চরিত্রে। গত বছরের নভেম্বর মাসে আমরা *রক্তকরবী* নিয়ে কায়রো উৎসবে গিয়েছিলাম। সে উৎসব থেকে ফিরেই এ নাটকটির কাজ ধরতে হয়েছিল। মাত্র ১২ থেকে ১৫ দিন সময় পেয়েছিলাম আমরা। এত অল্প সময়ে একটি মঞ্চনাটক তৈরি করে প্রদর্শন করা খুবই কঠিন কাজ। তবু আমরা সেই কঠিন কাজটাকে সত্যি করেছি। এই নাটকে একই সঙ্গে দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। এটা সত্যি কঠিন কাজ। দুটি চরিত্রের পোশাক-আশাক, মানসিক অবস্থা, স্বভাব, সংলাপ সবই ভিন্ন। রাতদিন খেটে আমাকে এই নাটকের জন্য তৈরি হতে হয়েছে। তবে মূল রচনাগুলো আমার পড়া ছিল বলে কিছুটা উপকার পেয়েছি। প্রচণ্ড ভয়ে ছিলাম সংলাপ মুখস্থ করা নিয়ে। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত টানা আমাদের কাজ করতে হয়েছে। (আতাউর, ২০০৯)

চার

অপেক্ষমাণ নাটকের ভাষানির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকার নূতন করে সংলাপ লিখেছেন কম, বরং ইবসেন থেকে রূপান্তর করেছেন বেশি। আবার, নিজের লেখা পুরাতন নাটকের ভাষা বা সংলাপ হুবহু তুলে ধরেছেন। ফলে, এ নাটকের সংলাপে শিল্পের কারুকাজ—উপমা, অলঙ্কারের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম চোখে পড়ে। *ঈর্ষা* নাটকের যে অংশ তিনি হুবহু তুলে ধরেছেন, সে অংশের ভাষার যে অপরূপত্ব, তার নূতন করে আলোচনা আমরা বাহুল্য মনে করছি। তবে হেনরিক ইবসেনের রচনা দুটি তিনি অনুবাদ করলেও তাকে এ-কাল ও সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তিনি সাজিয়েছেন। ফলে এ অংশগুলোতে ভাষার চমক, শব্দের নূতনত্ব, অলঙ্কার ও উপমার প্রয়োগ বেশ চোখে পড়ে। আর যেসব এলাকা তিনি নূতন করে বিন্যস্ত করেছেন সেখানেও তাঁর অনন্যতা দৃষ্টি এড়ায় না। এ নাটকে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেছেন। নাটকে সূত্রধার বা কোরাস হিসেবে ব্রেকডান্সারের দল যে গান ও নাচ পরিবেশন করেছে মঞ্চে, বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে তাও অভিনব ঘটনা। আধুনিক রক গানের ধাঁচে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন এবং তরুণসমাজে তুমুল জনপ্রিয় ব্রেকডান্সকে মঞ্চনাটকে উপস্থাপনের সম্ভাব্যতা তিনিই প্রথম ভেবেছেন। মূলত এমন সংগীত পরিবেশনা এবং নাচের মাধ্যমে তিনি নাটকে একটি পাশ্চাত্য ধাঁচের আবহ ও শিহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

নাট্যকার ব্রেকডান্সার চরিত্রের উপযোগী করে যে সংগীত রচনা করেছেন রক ধাঁচে, সেখানে তিনি স্বভাবতই কোনও নির্দিষ্ট সুর সংযোজন করেননি। তিনি চেয়েছেন ব্রেকডান্স যেমন তারুণ্যের উদ্দীপনায় হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয় এখানেও তেমনটা বজায় থাক। তিনি এমন করে পঙক্তির মাত্রা নির্ণয় করেছেন, শব্দের মালা গেঁথেছেন, যাতে পেশাদার না হলেও এ গান মঞ্চে ঠিকই পরিবেশন করা যায়, এবং ধ্বনিঝংকারে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায়। ফলে আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাসের ঝংকারে গানগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন—

হো হো ইবসেন
হেনরিক ইবসেন॥ [...]
দৃশ্য দৃশ্য
পুতুলের সংসার করে অবিমৃষ্য—
অবিমৃষ্য
আরো এক নাটকের সেই এক ব্যক্তি
ব্যক্তি ব্যক্তি
জনতার শত্রু সে চিহ্নিত হয় হোক হেনরিক ইবসেন ইবসেন
হো হো ইবসেন
হেনরিক ইবসেন
হেনরিক ইবসেন ইবসেন

সত্যের পক্ষেই তার অভিব্যক্তি
বলেছেন
হো হো ইবসেন
হেনরিক ইবসেন॥ (শামসুল, ২০১৬ : ৫০২)

এখানে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় ধ্বনিমাধুর্যে, শব্দের সুষমবিন্যাসে সংগীতের ভাষা কতটা উপযোগী এবং শিল্পমাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। যেহেতু এটি কোরাসের পরিবেশনা, তাই মূল পঙক্তির পরে আবার সে লাইন থেকে শব্দের পুনরাবৃত্তি সুরের লালিত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, সংগীতের ব্যবহারটি ঠিক নাটকে কেমন হবে, তা নিয়েও নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনাটি নিম্নরূপ—

সঙ্গীতের সঙ্গে তারা ব্রেক ডান্স শুরু করে।
সেই সঙ্গে গানের কথাগুলো শ্রুত হয়।
গানের কথাগুলোতে খুব একটা সুর দেবার দরকার নেই। ১-২/১-২ মাত্রায় আবৃত্তির মতো করেও বলা যেতে পারে। মূল ব্যাপারটা হবে ব্রেক ডান্সের ড্রাম ও কী বোর্ডের সঙ্গীত নির্ভর। দলটি নেচে চলে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০১)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্যমান নাটকে হেনরিক ইবসেনের মূলরচনা থেকে প্রায়ই হুবহু অনুবাদ করলেও তাঁর মতো জাত কবির হাতে পড়ে তা আরও প্রাঞ্জল ও নান্দনিক হয়ে উঠেছে। আবার, কাহিনির বুননের কারণে তিনি কিছু সংলাপ কাটছাঁট করে রচনা করেছেন; সমকালীনতা বজায় রাখতে অনেককিছু বদল করেছেন। যেমন—নোরা ও তার স্বামী যখন ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নিয়ে আলাপ করেছে, তখন তারা খ্রিষ্টধর্মাচার, যাজক, পাদ্রি, চার্চ প্রভৃতি অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক যখন সেটিকে অনুবাদ করেছেন তখন বাঙালি মুসলিম সমাজের ধর্মাচার এবং শিষ্টাচার মাথায় রেখেই তা করেছেন। যেমন—*এ ডলস হাউস* নাটকে হেলমার যখন নোরাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আটকাতে চেষ্টা করে তখন নোরা বলে :

নোরা ॥ ধর্ম বলতে কী বোঝায় তা আমি সত্যিই জানিনে। [...] বিয়ের সময় যাজক হ্যানসেন আমাকে যা বলেছিলেন সেটাই আমি কেবল জানি—তিনি আমাকে বলেছিলেন ধর্ম বলতে এই বোঝায়—ওই বোঝায়। এখান থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়ানোর পরে আমি দেখতে চাই যাজক হ্যানসেন ঠিক কথা বলেছিলেন কি না; অন্তত, তিনি যা বলেছিলেন সে কথা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না।
হেলমার ॥ তোমার মতো যুবতীর মুখে এইরকম কথা শোনার কল্পনাও কেউ কখনও করেনি। (সুনীল, ১৯৮৩ : ৮৫)

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে এ কথালাপ ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে, যেখানে সুস্পষ্ট হয়েছে সাধারণ বাঙালি মুসলিম পরিবারের শিষ্টাচার, জীবনাদর্শ :

স্বামী। এত বোঝো, আর এটুকু বোঝো না যে তোমার স্থান হচ্ছে তোমার সংসারে। হ্যাঁ, সংসারেই। [...] হাদিস কোরান, গীতা বাইবেল, মানে ধর্ম—তোমাকে শেখায়নি?
স্ত্রী। শুনতে তোমার হয়তো খারাপই লাগবে—ধর্মটা যে কী, আমি ঠিক বুঝি না। [...] ধর্ম তো এই—মোল্লারা যা বলে, পাদ্রীরা যা বোঝায়, যা ব্যাখ্যা করে! এবার আমাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে। জীবনের পাঠ নিয়ে দেখতে হবে সত্যটা আছে কোথায়। আমাকে জানতেই হবে মোল্লারা যা বলে তার কতখানি সত্য, আর কতটা মনগড়া। বা, ওরা যা বলে তা আমার বেলায় খাটে কিনা! (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৫)

আবার *এ ডলস হাউস* নাটকের হেলমার চরিত্রের (*অপেক্ষমাণে* পুরুষ চরিত্র) মুখে আরবি শব্দমিশ্রিত সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন তিনি। নোরা বা নারী যখন তাকে জানিয়েছে মোল্লা-নির্ধারিত ধর্মে তার আপত্তি আছে, সে নিজের ধর্ম-কর্ম নিজেই বুঝে নিতে চায় বাস্তবতার নিরিখে তখন হেলমার তথা স্বামী চরিত্রটি জানিয়েছে : "স্বামী। তওবা করো, তওবা করো। মানুষ তোমার মুখে থুতু দেবে।" (শামসুল, ২০১৬ : ৫১৫)

সৈয়দ শামসুল হকের কবিমানসের অনেকটা জুড়েই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর প্রায় রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি কিংবা রচনার অংশবিশেষ জুড়ে দিয়েছেন। *ঈর্ষা* কাব্যনাটকেও প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান কিংবা কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হতে দেখা যায়। *অপেক্ষমাণ* নাটকেও রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার চরিত্রটি যখন বলেছে—একা মানুষেরই কোনও ভয় থাকে না। পিছুটানহীন মানুষই পারে নির্ভীক চিত্তে মিথ্যের মোড়কে জড়ানো সমাজের সঙ্গে অকুণ্ঠ চিত্তে লড়ে যেতে, তখন প্রৌঢ় চরিত্রটি তাকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য নাট্যচিন্তার সঙ্গে প্রাচ্যকবি রবীন্দ্রনাথের এই মেলবন্ধন নাটকটিকে করে তুলেছে অনন্যস্বাদী। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> পুরুষ। একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না।
> তবে, একা হয়ে ওঠাটাই যা মুশকিল।
> সবাই পারে না। সবার কাছে একা মানেই—অসহায়।
> আমার কাছে নয়। আমি এটা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি।
> প্রৌঢ়। ও! আপনি তাহলে সেই গানের লোক—মুশকিলে ভরসা দিতে চান?
> 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে!' (শামসুল, ২০১৬ : ৫২২)

মূল *এন এনিমি অব দ্য পিপলে* যখন ডাক্তার স্টকম্যান, মেয়র পিটার স্টকম্যান ও জনতা সভামঞ্চে মুখোমুখি হয়েছে, তখন জনতার বাক্যালাপ ছিল উত্তর-প্রত্যুত্তরধর্মী; একটি সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারীরা যেমন নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে বা বক্তাকে প্রশ্ন করে ঠিক সেরকম। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক যখন এ অংশটি অনুবাদ করেছেন তখন এদেশীয় ঝাঁজ বজায় রেখেছেন। বাংলা অঞ্চলে সাধারণ জনতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো—কোনও কিছু পছন্দ না হলে 'ভূয়া ভূয়া' বলে দুয়োধ্বনি তোলা। আবার, এদেশের মিছিলের জনপ্রিয় স্লোগানগুলোকেও নাট্যকার নাটকে উপস্থাপন করে পাশ্চাত্যের একটি নাটককে এদেশীয় সামাজিক বাস্তবতায় ঢেলে সাজিয়েছেন। যেমন :

১. জনতা। ভূয়া! ভূয়া!
ভূয়া ভূয়া! (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)
২. রাজধানীর গোড়াতে — আগুন জ্বালো।
জ্বালো জ্বালো — আগুন জ্বালো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)
৩. চলো চলো — রাজধানী চলো।
ষড়যন্ত্রের গোড়া মারো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)
৪. ডাক্তারের চামড়া — তুলে নেবো আমরা।
ডাক্তারের চামড়া — তুলে নেবো আমরা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৬)
৫. জুতা মারো তালে তালে।
জুতা মারো দুই গালে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৭)

এছাড়াও *অপেক্ষমাণ* নাটকের ভাষায় ব্যবহৃত কিছু নান্দনিক অলঙ্কার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীক, প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

১. এক নারী মঞ্চের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৩)

২. রাগ? রাগ তো পানির মতো।
আগুন পেলে টগবগ করে ফোটে,
কিছুক্ষণ পরেই ঠান্ডা হয়ে যায়। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৭)

৩. যারাই মিথ্যার সঙ্গে বসবাস করে, জনতাকে ভুল পথে নিয়ে যায়,
আপন স্বার্থে ব্যবহার করে—
মহামারীর বীজাণু ছড়ানো কীটের মতো তাদের মেরে ফেলা উচিত। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৩)

উৎপ্রেক্ষা :

১. খাতার ওপরে কামরুল তাঁর দ্রুত হাতে কলমের টান দিয়ে
চলেছেন—
আকঁছেন হীরামন পাখির শরীর, তার ঠোঁট, তার পালক, বিশাল আকাশ—
কামরুল এঁকে চলেছেন—
মেয়েটির বিস্ময়ভরা চোখের সমুখে যেন ঘটে যাচ্ছে
ইন্দ্রজাল! (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৮)

চিত্রকল্প :

১. ভাবছি এবার থেকে প্রকৃতির ছবি আঁকবো।
যেমন ওই যে অসাধারণ ভোরের কথা বললাম,
বিস্তীর্ণ পাথারের ওপর সূর্য উঠছে।
একটু একটু করে কাঁটাবন, শস্যকাটা মাঠ,
শুকনো খড়ের স্তূপ, রুখো মাটি,
ভোরের রক্তমাখা আলোয় ফুটে উঠছে, আঁকবো। (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৬)

রূপক/প্রতীক :

১. এ তো আর আজকের দিনের হালকা পল্কা দরোজা নয়।
ওক কাঠের দরোজা, ঊনবিংশ শতাব্দীর। কঠিন! [...]
সমাজটার মতোই! (শামসুল, ২০১৬ : ৫২০)

২. আমি অবাক হয়ে যাই কীভাবে মৃতের শাসনে জীবিতেরা আজ পড়ে আছে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩২)

সমাসোক্তি :

১. হ্যাঁ, রক্ত! মিথ্যার আঘাতে সত্যের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৩)

২. জীবনের মিথ্যা তোমাকে শিল্পের মিথ্যা করে তুলবে।
তোমার ছবি হবে প্রতারক—হবে অশুদ্ধ—দূষিত। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩৫)

বাগধারা/ প্রবাদ/ প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. একা হয়ে যেতে হয় সত্যের সম্মুখেই
শক্তিটা আছে শুধু সত্যেই— (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৩)

২. নারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত শব্দটা অচল, বিস্ময়কর? (শামসুল, ২০১৬ : ৫০৮)

৩. সেটা হচ্ছে রাজধানীর মতলবী ফাঁদ। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৫)

৪. ডাক্তারের কাজ শুধু রোগের চিকিৎসা করা নয়, ডাক্তারের প্রথম কাজ—আমার বিবেচনায়—
রোগের কারণ নির্মূল করা। (শামসুল, ২০১৬ : ৫২৯)

৫. পিলে চমকে ওঠে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩০)

৬. সত্যের পক্ষে যারা তারা চিরকালই সংখ্যালঘু— (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

৭. শক্তি তাদেরই হাতে যারা সত্যমিথ্যা বিচার করতে পারে,
ভালো মন্দ স্পষ্ট করে নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখে। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

৮. সত্য কাউকে মুকুট পরায় না। সত্য মানুষকে বিকশিত করে।
সত্য মানুষকে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে দেয়। (শামসুল, ২০১৬ : ৫৩১)

পাঁচ

হেনরিক ইবসেন ছিলেন নরওয়েজিয়ান সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। অবশ্য তিনি তাঁর মহৎ রচনাপঞ্জি ও দূরদর্শী শিল্পদৃষ্টির জন্যে দেশকালের গণ্ডি ছাপিয়ে হয়ে উঠছেন বিশ্বজনীন। শিল্প এবং সমাজের যুগপৎ অবস্থান তাঁর নাট্যরচনার একটি বিশেষ প্রবণতা। প্রচলিত ভিক্টোরীয় সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও বিবিধ অসঙ্গতি বাস্তবতার নিরিখে তাঁর নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে। এসকল গুণই হেনরিক ইবসেনকে সাধারণের চোখে অসাধারণ করে তুলেছে। বস্তুত, "তিনিই প্রথম সমালোচকের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখে নাটকের সমাপ্তিতে বৈচিত্র্য আনেন। অর্থাৎ ইবসেনই প্রথম নাট্যকার, যিনি ইউরোপীয় নাট্য ঐতিহ্যের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে নাট্য রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে মানুষের কথা ও সমালোচকদের তীক্ষ্ণ তীরও হজম করতে হয়েছে। [...] প্রথমে তাঁর চিন্তা ও কর্ম বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হলেও পরবর্তী সময়ে সেই চিন্তাগুলোই সমগ্র ইউরোপে ও পরে বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে" (ফরিদ, ৩ জুন ২০১৬ : সাহিত্য পাতা)। বাংলাদেশেও সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে হেনরিক ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব; যাকে ঘিরে এদেশের প্রথিতযশা নাট্যকারগণ হেনরিক ইবসেনের বিভিন্ন বিখ্যাত নাট্যকর্ম অনুবাদ করেছেন এবং দেশের স্বনামধন্য নাট্যদলগুলো সেসব নাটক মঞ্চে পরিবেশনায় ব্রতী হয়েছেন। ফলে এদেশের নাট্যামোদী দর্শক ভিনদেশি এ নাট্যকারের দর্শন ও সমাজবোধের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তবে সৈয়দ শামসুল হক এ ধারায় নিঃসন্দেহে অনন্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নাট্যজন আতাউর রহমানের অনুরোধে ইবসেনের নাটকের রসনির্যাস গ্রহণ করে তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাবৃত্তিকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন এবং তিনটি নাটকের মূলসার সমীকৃত করে সৃষ্টি করতে পেরেছেন কালজয়ী মৌলিক কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ*। এ-নাটকে সৈয়দ হক নাট্যপ্রতিভার যে-স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন তার দ্বিতীয় স্বাক্ষর বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে বিরল।

টীকা

১. এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে আতাউর রহমান বলেন : "ইবসেনের উৎসবে নাটক মঞ্চায়নের কথা বলা হলে মাথার মধ্যে একটা ভিন্ন কাজ করার পরিকল্পনা আসে। সেই মতো সৈয়দ শামসুল হককে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী এভাবেই নাটকটি লেখার অনুরোধ করি।" (দ্রষ্টব্য : আতাউর রহমান, *'রক্তকরবী থেকে অপেক্ষমাণ'*, "আনন্দ পাতা", *দৈনিক প্রথম আলো*, সম্পাদক : মতিউর রহমান, ঢাকা, ১২ নভেম্বর, ২০০৯)

২. মূল কাব্যনাটকের সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গ্রন্থ থেকে।

৩. আলোচনায় ব্যবহৃত *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের সব উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে খায়রুল আলম সবুজ অনূদিত *এন এনিমি অব দ্য পিপল*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ গ্রন্থ থেকে।

৪. হেনরিক ইবসেনের *এ ডলস হাউস* নাটকের যাবতীয় উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সুনীল কুমার ঘোষ অনূদিত এবং সম্পাদিত *ইবসেন নাট্য-সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৮৩ গ্রন্থ থেকে।

সহায়কপঞ্জি

আতাউর রহমান (২০০৯)। 'রক্তকরবী থেকে অপেক্ষমাণ'। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, আনন্দ পাতা, ১২ নভেম্বর।

(২০১০)। প্রতিবেদন : 'কায়রো নাট্য উৎসবে বাংলাদেশের দুই নাটক'। বাংলানিউজটোয়েন্টি ফোর.কম, ঢাকা, লাইফস্টাইল, ৯ অক্টোবর।

খায়রুল আলম সবুজ (অনূ., ২০১৮)। *এন এনিমি অব দ্য পিপল*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

জাকির তালুকদার (২০১৬)। 'সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য : শক্তিকেন্দ্রের সন্ধানে'। *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, শামসুজ্জামান খান সম্পা., বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ফরিদ হাসান (২০১৬)। 'হেনরিক ইবসেন : প্রথা ভাঙার নাট্যকার'। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, সাহিত্য পাতা, ৩ জুন।

সুনীল কুমার ঘোষ (সম্পা., ১৯৮৩)। *ইবসেন নাট্য-সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*। সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা।

সৈয়দ শামসুল হক (সম্পা., ২০১৬)। *কাব্যনাট্যসমগ্র*। চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা।